Lubdhak - Prabandho – Others – Bandho Karkhana, Civil Society – Subhendu Dasguptta

লুব্ধক - বন্ধ কারখানা, সিভিল সোসাইটি - শুভেন্দু দাশগুপ্ত

পশ্চি মবাংলার অর্থনীতিতে, শিল্পের অর্থনীতিতে একটা ভাবার মত বিষয় বন্ধ কলকারখানা। একটা কারখানা বন্ধ হবার আগে, বন্ধ করে দেবার আগে রুগ্ন হয়, রুগ্ন করে দেওয়া হয়।

একটা কারখানা রুগ্ন হলে কিভাবে তাকে সারিয়ে তোলা যায় সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার দায়িত্ব সরকারি সংস্থা ব্যুরো অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনানসিয়াল রিকভারি এক কথায় বি. আ. এফ. আর। দেখা যাচ্ছে একটা কারখানাকে বাঁচিয়ে তোলার বদলে তাকে ভেঙ্গে ফেলাই বিআইএফআর এর কাজ। শুধু খেয়াল রাখা কারখানাটায় যারা বিনিয়োগ করছে এবং কারখানা চালাতে ধার দিয়েছে তাদের টাকাটা পাইয়ে দেওয়া। অন্যদিকে শ্রমিক কর্মযারীদের পাওনা মেটানোর কোন ব্যবস্থা না নেওয়া। এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায় যে, কারখানাটা কি করে বাঁচানো যায় এই আলোচনায় কখনো শ্রমিকদের যুক্ত করা হয় না। যদিও কারখানাটা বাঁচানোর দায় সবচাইতে বেশি তাদেরই, এটাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

একটা কারখানা বাঁচানোর কাজে যেসব সরকারি ব্যক্তিদের ডাকা হয় পরামর্শ দিতে, তারা যথেষ্ট মন দেয় না। একটা কিছু তাৎক্ষণিক, অল্প সময়ের জন্য কাজে লাগানো গোছের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যার কোন দীর্ঘকালীন লক্ষ্য থাকে না। রুগ্ন কারখানাটা ততক্ষণ পর্যন্ত চালানো হয়, যতক্ষণ না কমতে থাকা রসদ সব শেষ হয়, যতক্ষণ না হয় পুরনো মালিক কিংবা নতুন মালিক সবটা শেষ করে দেয়, কারখানা বন্ধ করে না দেওয়া হয়।

রুগ্ন কারখানা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, কারখানাটা বাঁচাতে সরকার মালিকদের নানা সুযোগসুবিধা দেয়। মালিকরা সেই সুবিধা কারখানা বাঁচাতে কাজে লাগায় না। বরং নিজেদের পাওনাটা পুষিয়ে নেয়।

অন্যদিকে কারখানা রুগ্ন থেকে বন্ধ হয়ে যাবার পথে নানাভাবে শ্রমিকদের বঞ্চি ত করা হয়, সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় ছাঁটাই করা হয়, পাওনা সুযোগ সুবিধা কেটে নেওয়া হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয়, এই সব। কারখানা রুগ্ন হয়ে থাকা, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চ য়তা আর ভয় তৈরি করে। এই সুযোগে মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাগুলো কমিয়ে দিতে থাকে। বন্ধ করে দিতে থাকে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড খাতে শ্রমিকদের কাছ থেকে যে টাকটা কেটে নেওয়া হয়, সেটা সরকারের ঘরে জমা দেওয়া হয় না। চিকিৎসা খাতে যে টাকা কেটে নেওয়া হয় সেটা জমা না দেওয়ায় শ্রমিকরা, তাদের পরিবারের লোকেরা সময়মতো চিকিৎসা পান না, অবসর নেবার পর পাওনা গ্রাচুইটির টাকা দেওয়া হয় না।

একটা কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকরা বেকার হয়ে যায়। তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের মানুষজন দুর্দশায় পড়ে, কারখানা ঘিরে যে বাজার, দোকান এবং আরও নানা ছোট উৎপাদন ও ব্যবসা গড়ে ওঠে তা ভেঙ্গে যায়।

কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের লড়াই করার কথা। কিন্তু করতে পারেনি, পারছে না। যখনই কোন শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ে বা বন্ধ হয়ে যায় সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলোও যেন ভেঙ্গে পড়ে। কোন কোন সময় মালিক, সরকার ও একধরনের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে সমঝোতা তৈরী হয়, যা শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। আগে পরে যেসব চুক্তি হয় তা শ্রমিকের অনুকূলে যায় না। এখনকার পুঁজির আর সরকারের আক্রমণে ট্রেড ইউনিয়ন দিশাহারা। নতুনঅর্থনীতি, নতুন বাজার, শিল্পের অবস্থা, এইসব নিয়ে তাদের অজ্ঞতা, অপ্রস্তুতি। বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়েনের নেতা রাজনীতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, সরকারে থাকা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, সরকারে যেতে চাওয়া রাজনীতিক দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এবং সরকারের কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, বন্ধ করে রাখা নীতির বিরুদ্ধে যেতে পারে না। দায়িত্ব নিয়ে শ্রমিকদের একজায়গায় করে কারখানাটা বাঁচানোর, আবার চালু করার উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা থাকে না।

দায়িত্ব শ্রমিক সংগঠন পালন করেনি, করেনা, দায়িত্ব সরকার পালন করেনি, করেনা।

সরকার বন্ধ কারখানা নতুন করে খোলার ব্যাপারে মালিকদের কর ছাড় দেয়, ভরতুকি দেয়। মালিকরা সরকারের দেওয়া এইসব সুযোগসুবিধা কারখানা খেলার কাজে লাগায় না। সরকার কিছু বলে না। মালিকরা বন্ধ করে রাখা কারখানার শ্রমিকদের দেওয়া প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ই এস আই এর টাকা সরকারে জমা দেয় না, শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেয় না। কারখানার বাড়তি জমি আবাসন তৈরীতে দিয়ে দেয়। সরকার কিছু বলে না।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফ্যাকটরী ডিসম্যান্টলিং অ্যাক্ট-এ বলা আছে যদি কোন কারখানা ভেঙে ফেলতে হয় তাহলে ভেঙে ফেলার আগে শ্রমিকদের সব পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। ১৯৫২ থেকে এই আইন রয়েছে, কিন্তু আইনের নিয়মগুলো বানানো হয়নি, আইনটা কাজে লাগে নি। সরকার কাজে লাগানোর চেষ্টা করেনি। কোম্পানি অ্যাক্টের ধারায় আছে কারখানা বিক্রি হবার সময় সরকারি লিকুইডেটর বিক্রির টাকা থেকে শ্রমিকদের সব পাওনা মিটিয়ে দেবে, দেয় না।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের গ্রাচুইটির টাকা দেওয়া হয় না এই অজুহাতে যে, শ্রমিকরা কারখানা বন্ধ হবার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করেনি। সাধারণত কারখানা বন্ধ হবার পর শ্রমিকরা এত ব্যস্ত থাকে যে সময়মত দরখাস্ত করার অবস্থায় থাকে না। সরকার এটা বুঝতে চায় না।

১৯৯৯ - ২০০০ সালে পশ্চি মবঙ্গ রাজ্য বাজেটে ৫০ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা চালু করার জন্য। তারপর টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয় ১০০ কোটি। ১২৫ টা প্রস্তাব জমা পড়েছিল। ৪টে কারখানা খোলার প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল যাতে ৪ কোটি টাকা ব্যয় হবার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন নীতি নেই। কোন প্রকাশিত তথ্য নেই কারখানা বাঁচিয়ে তোলার জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে? তাতে কটা কারখানা খোলা গেছে?

সরকার তার হাতে যে ব্যবস্থা বিধি আছে তা কাজে লাগায় না। তার হাতে কারখানা খোলার, শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে দেবার যা বিধি আছে তা প্রয়োগ করে না। এবং বন্ধ কলকারাখানা নিয়ে তার আরও যা যা দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দায়িত্বগুলো এই রকম

বন্ধ কারখানার জমি শুধু নতুন কারখানা বানাতে অথবা শ্রমিকদের প্রয়োজনে অন্য কোনো কাজের জন্য ব্যবহার করা হবে। এর বাইরে কোন কাজের নয়। এটা সরকারের দেখা দরকার।

বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা যদি কেউ কেনে অথবা সরকার নিয়ে নেয় তবে হাত বদলের দিন থেকে একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা প্রয়োজন, যার মধ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। সরকারকে এটা নজর রাখতে হবে।

সরকারকে একটা পদ্ধ তি ঠিক করতে হবে কিভাবে প্রয়াত শ্রমিকের পাওনা তার উত্তরাধিকারী পাবে।

এই রকম আরও কিছু কিছু বিষয় সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে।

যেমন

বন্ধ কারখানার মালিকানা বদল হলে, বিক্রি হলে শ্রমিকদের সব পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে;বন্ধ কারখানার জায়গায় নতুন কারখানা চালু হলে শ্রমিকদের নিতে হবে। নেওয়া না গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;বন্ধ কারখানা বিক্রি করতে হবে চালু কারখানা হিসাবে;কারখানা কিনেই ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া চলবে না, যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে শ্রমিকদের কাছ থেকে কারখানা বাঁচানোর প্রস্তাব পেতে;শিল্পের বর্গ যেমন পাট, কাগজ, চা, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং ধরে ধরে কারখানা বাঁচানোর নীতি বানাতে। সরকার দায়িত্ব নেয় নি। নিচ্ছে না।

ফলে একটা তথ্যে পশ্চি মবাংলায় এখন বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৫৪,০০০। আর একটা তথ্যে কারখানা বন্ধ হওয়ার ১৯৮১-৯১ থেকে ১৯৯১-২০০১ এ মোট শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে শিল্প শ্রমিগের সংখ্যা কমেছে। অন্য একটা হিসাবে পশ্চি মবাংলায় ৬৯,২৬৯টা নথিভুক্ত কারখানার মধ্যে ২৯,২১৯ টা বন্ধ।

পশ্চি মবঙ্গ সরকারের শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর রাজ্যের ৫০০টা বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা, নিয়ে একটা সমীক্ষা করেছে। ৪০২ টা রুগ্ন ও দুর্বল কারখানা, ৯৮টা বন্ধ, ৬৪টা সরকারি, বাকিটা বেসরকারি। ৩২৭টা বড় ও মাঝারি কারকানা, তাতে রয়েছেন ৩,৩৮,৯২০ জন শ্রমিক, বাকি ১৭৩টা ছোট কারখানা তাতে রয়েছেন ১৩৩৪৩ জন শ্রমিক

বন্ধ কারখানা নিয়ে, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে, তাদের দক্ষতা, কাজ, পাওনা নিয়ে, মালিকদের বেআইনী কাজ নিয়ে, কারখানার জমি দখলকারী নিয়ে, শ্রমিক পরিবারের কষ্ট

নিয়ে সরকার দায়িত্বহীন, ট্রেড ইউনিয়ন দায়হীন।

আর আমরা যারা এই সব বিষয় দেখছি, লিখছি পড়ছি তারাও দায়দায়িত্ব পালন করছি না।

পশ্চি মবাংলায় একটা কার্যকর সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠেনি। সিভিল সোসাইটি বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছি একটা তৃতীয় ভূমির কথা। প্রথম ভূমিতে সরকার, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ভূমিতে রাজনীতিক দল, প্রধান ক্ষমতাবান, ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক দল, দলেরা, রাজনীতিক দলের শাখা সংগঠন, তৃতীয় ভূমি এই দুই ভূমির বাইরে। তৃতীয় ভূমির প্রধান কাজ ক্ষমতার সমালোচনা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজনীতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমালোচনা।

পশ্চি মবাংলায় ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতার সমালোচনা করার দায় পালন করেছে বামপন্থী রাজনীতিক দলেরা, দলের শাখা সংগঠনরা, সমালোচক সিভিল সোসাইটির জায়গা তৈরি হয়নি। সমালোচক রাজনীতিক দলেরা, বিরোধী রাজনীতিক দলের ক্ষমতায় চলে এসেছে, ক্ষমতায় থেকে যাচ্ছে পশ্চি মবাংলায়। ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক দলের শাখা সংগঠনরা সরকারের, সরকারের পাশে থাকা ক্ষমতাবান গোষ্ঠীদের সমালোচনা করেন। ক্ষমতাকে সমালোচনার যে জায়গা পড়ে থাকলো, তাতে এলো না। অন্য কোন রাজনীতিক দল, তাদের উদ্দেশ্য একদিন ক্ষমতায় যারা এলোনা অন্য কোন শাখা সংগঠন, তাদের মূল রাজনীতিক দলের বাইরে কোন স্বাধীনতা নেই।

পশ্মিমবাংলায় কারখানা বন্ধ আছে, বন্ধ হচ্ছে, খোলা হচ্ছে না। পুঁজি তার দায় পালন করছে না। প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন করছে না। বন্ধ কারখানা নিয়ে পুঁজির এবং সরকারের সমালোচনা হচ্ছেনা। একসময়ের বিরোধী দল, বামপন্থীদল, যারা শিল্প, শ্রমিক, কারখানা নিয়ে ক্ষমতার বিরোধিতা করত, এখন তারা বহুকাল ধরে ক্ষমতায়। ফলে বামপন্থী দলের, দলেদের কোন প্রতিবাদ নেই। বন্ধ কারখানা নিয়ে প্রতিবাদ করার কথা শ্রমিক সংগঠনের, ট্রেড ইউনিয়নের। পশ্চি মবাংলায় প্রায় সব ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিক দলের, ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের, শাখা সংগঠন। শাখা সংগঠন মূল সংগঠনের বিরোধিতা করতে পারেনা। বন্ধ কারখানা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন হয়নি।

সমাজকর্ম সংস্থা যাদের ডাক নাম এন.জি.ও তারা নানা বিষয় নানা ধরনের কাজ করে। শিল্প, শ্রমিক, কারখানা নিয়ে কোন এন.জি.ও দের কাজ করতে দেখা যায়না। পশ্চি মবঙ্গে একমাত্র সংস্থা নাগরিক মঞ্চ । এন.জি.ওদের কাজের জায়গা তাদেরকে যারা অর্থ সাহায্য দেয় তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। কোনও অর্থসাহায্য সংস্থার কাছের উদ্দেশ্যের মধ্যে বন্ধ কারখানা নেই। বন্ধ কারখানা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কোন সমালোচনা তৈরী হয়না। সংবাদ মাধ্যম সেই সব বিষয় নিয়ে কাজ করে যে সব বিষয়ে পাঠক মহলে চাহিদা আছে। বন্ধ কারখানা পাঠক মহলে চাহিদার বিষয় হয়নি। বন্ধ কলকারাখানা নিয়ে সরকারের সমালোচনায় নেই রাজনীতিক দল, রাজনীতিকদলের শাখা সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন। এন .জি.ও, সংবাদ মাধ্যম। বন্ধকারখানা নিয়ে সমালোচনায় আসতে পারতো তৃতীয় ভূমি সিভিল সোসাইটি।

বন্ধ কারখানা নিয়ে সমালোচনায় সিভিল সোসাইটি আসেনি। সিভিল সোসাইটির প্রধান অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কোনদিনই শিল্প শ্রমিক কারখানা নিয়ে জানতে চায়নি। ধরে নিয়েছে এটা ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়। যা করার ট্রেড ইউনিয়ন করবে। যখন প্রয়োজন পড়লো বন্ধকারখানা নিয়ে সরকারের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নেরও সমালোচনা করা, তখন সিভিল সোসাইটি এগিয়ে এলোনা।

পশ্চি মবঙ্গে এখন ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের আধিপত্য। তারা সমাজের সব অংশেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা কোন স্বাধীন সার্বভৌম অংশ ছেড়ে রেখে দিতে চায়না। সিভিল সোসাইটির সম্ভাব্য সমালোচক অংশটিকেও তারা স্বাধীনতা দিতে চায়না, স্বাধীনতা না দেবার পদ্ধ তি লোভ দেখানো ও ভয় পাওয়ানো।

ক্ষমতা এখন নতুন অর্থনীতির প্রবক্তা, প্রচারক, বন্ধ কারখানাকে তারা নতুন অর্থনীতির ফল হিসাবে দেখতে চায়। এই নতুন অর্থনীতির প্রচারে ক্ষমতা প্রায় সবার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এই মান্যতায় সিভিল সোসাইটি নতুন অর্থনীতির বিরুদ্ধে জোরদার সমালোচনা প্রতিবাদ করতে পারছেনা।

এই অবস্থার সামনে দাঁড়িয়ে সিভিল সোসাইটির যে অংশটা এখন প্রতিবাদী সমালোচক থেকে যাচ্ছে তার আলোচনায় আসা দরকার বন্ধকারখানা, বন্ধকারখানা শ্রমিক। শ্রমিকের পরিবার, শ্রমিকের বকেয়া পাওনা, পুঁজির দায়, সরকারের দায়িত্ব, বন্ধ কারখানা খোলার সম্ভাব্য উপায়, বন্ধ কারকানা খোলার বাধা, আইন, শ্রমিক সবাই এইসব।

(নাগরিক মঞ্চে র উদ্যোগে বন্ধকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় কলকাতায় ২৭,২৮ নভেম্বর ২০০৪। এই লেখা সেই আলোচনায় বলা কথা নিয়ে)

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিল জীবনের ভুল। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।
আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জরাসন্ধ।

জুন মাসের এক পড়ন্ত বিকেল। বসে আছি দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপিতে এক গ্রামের এক - চিলতে এক ঘরে। ঘরের মধ্যে আলতো অন্ধকার। উল্টো দিকে পার্টি - অফিস। সেখানে ইতিমধ্যেই আলো জ্বলে উঠছে। জোর আলোচনা চলছে সেখানে। তপ্ত কথাবার্তার কিছুটা চুঁইয়ে ঘরে আসছে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে কুলপিতে জাহাজ - বন্দর তৈরি হবে। খবরের কাগজ মারফৎ সকলে জেনেছে। সরকার এই বন্দরের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। কিন্তু, বাদ সেধেছে। 'প্রতিক্রিয়াশীল' সেই শক্তিকে কী করে ঠেকানো যায়, আলোচনায় উঠছে সেই প্রসঙ্গ।

আমি অন্য কাজে এসেছি। আমার ভিটে-মাটি কলকাতায়। এখানকার কাজ কোনওমতে গুছিয়ে একটু পরেই দূরপাল্লার বাসে চেপে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে যাব। ঘড়ি দেখছি। হাইওয়ে দিয়ে শব্দ করে চলে যাচ্ছে কলকাতামুখী বাস। ট্রাক। আমার সহকর্মীও ঘড়ি দেখছে ঘন - ঘন। বেলা হয়ে আসছে। না কি, বেলা পড়ে আসছে?

আমাদের ঘিরে তখনও বসে আছে গোটা দশ-বারো শুকনো মুখ। মহিলা ও পুরুষ- উভয়েই। আমাকে, আমাদের তারা তাদের দুঃখের সাতকাহন বলছে। আমরা লিখে নিচ্ছি। তারা কি খায়, দিনে কত টাকা রোজগার করে, আজ রাতে বাড়িতে কী রান্না হবে, হিসেব নিচ্ছি তার। প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছি এইসব। যাদের ডাকে গিয়েছি, হঠাৎ-ই তাদের একজনকে দেখি, এক মহিলাকে হাত ধরে টেনে আনছে। ভদ্রমহিলা দৃশ্যতই অনিচ্ছুক, লজ্জিত। আমাদের পূর্ব - পরিচিত ভদ্রমহিলা তখনও মুখে বলে চলেছেন, 'এসা, ওরা তো তোমার কথাই শুনতে এসেছেন।'

ভদ্রমহিলা এনেল বসলেন না। দরজা ধরে দাঁড়ালেন। আমাদের পরিচিত সেই ভদ্রমহিলার ক্রমাগত তাড়নাতেও তার মুখ দিয়ে বের হল না একটি শব্দ। আভিজাত্যের সব চিহ্ন সেই মহিলার চেহারায়। তবু, মুখ ভর্তি বিষাদ। আমাদের পূর্ব - পরিচিত মহিলাই শেষ পর্যন্ত জানালেন, 'জানেন, মাসে পনেরো থেকে কুড়ি দিন এরা কী খেয়ে থাকে? মুলো সেদ্ধ।'

আমরা অবাক। ভাত খায় ন?

-ভাত পেলে তো খাবে। কে দেবে ভাত?

ভদ্রমহিলার বাড়িতে স্বামী ও দুই ছেলে - মেয়ে - নিয়ে চারজন সদস্য। স্বামী কোনও দিন কাজ পান, কোনওদিন পান না। অতএব, এ - ভাবেই দিন গুজরান, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এক - ফসলি এলাকা। কাজ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? অতএব, মেনে নিয়েছেন দারিদ্র, মেনে নিয়েছেন বিষাদ। সে-বার আমাদের গবেষণা-পত্রটি লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে চলে এসেছি। সেই মহিলার কী হল, খোঁজ রাখিনি আর। তার কাছে আমরা গ্রাম - পঞ্চ ায়েতের ভূমিকা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলাম। আশ্চ র্য নিস্পৃহ, জীবনের সব শোক - দুঃখকে নিয়তি বলে মেনে নেওয়ার অদ্ভুত সহনশীলতা দেখিয়ে দমিত গলায় তিনি বলেছিলেন, 'দু-চারবার জানিয়েছি গ্রাম - সদস্যকে। সে বলে, মাসি পঞ্চ ায়েতের তো এখন টাকা নেই। সরকারি প্রকল্পে চাল - গমও আসছে না। এলে, তবে না পাবে!'

সে-দিন আর আসেনি, আসে না, যেদিন ওদের ঘরেও ভাতের গন্ধ পাওয়া যায়। পশ্চি মবঙ্গে প্রায় তিন - দশক ধরে শাসন ক্ষমতায় থাকা সরকার দুটি বিষয়ে তাদের সফলতার কথা দিগ্বিদিকে প্রচার করে বেড়ায়। বাঙালি বলে পশ্চি মবঙ্গে বাইরে গিয়ে আলাদা খাতির পেয়েছি এই সূত্রে। ভূমি - সংস্কার আর পঞ্চ ায়েত ব্যবস্থা নিয়ে কত উৎসাহ সেখানে। সকলেই জানতে চান, বুঝতে চান, প্রশংসায় রীতিমতো কুণ্ঠিত করে তোলেন। বিকেন্দ্রীকরণ দরকার। কিন্তু, দল-ভিত্তিক রাজনীতিসর্বস্ব এই বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষত সেকী মারাত্মক বাস্তব, তা সবচেয়ে ভালো জানেন রাজ্যের গ্রামাঞ্চ লের ভুক্তভোগী মানুষেরা। শহরে বসে তার সবটা মর্মার্থ কখনওই বোঝা সম্ভব নয়।

রাজ্যে পঞ্চায়েতগুলির উদাসীনতা সর্বাত্মক। দল আর গোষ্ঠী-রাজনীতিতে সে-গুলি দীর্ণ-বিদীর্ণ। লক্ষ - লক্ষ টাকার নয়ছয় এখানে মানুষের চোখে প্রায় - বৈধ। পঞ্চ ায়েত প্রধানরা এখানে জলকরের অংশীদার, পাওয়ার টিলারের মালিক। মুশকিল হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ যত হয়েছে, দলগত অবস্তানের দরুণ প্রকৃত গরিবের প্রবেশাধিকার ততই সীমায়িত হয়ে এসেছে। গ্রাম - পঞ্চ ায়েত, অঞ্চ ল - পঞ্চ ায়েত, পঞ্চ ায়েত সমিতির প্রশাসনে উঠে এসেছেন মধ্যবিত্ত স্কুল - শিক্ষক, ধনী কৃষক, চাকরিজীবী শ্রেণি, যারা আর যাই হোক, কেউই প্রকৃত অর্থে অন্তেবাসীর প্রতিনিধি নন।

অতএব, যা হওয়ার তাই হয়। দরিদ্র মানুষকে কাজ যোগানোর জন্য তৈরি সরকারি প্রকল্পে ডেকে আনা হয় ঠিকাদারদের। ঠিকাদার তার ব্যবসা - বুদ্ধি প্রয়োগ করে বোঝে, স্থানীয় মানুষকে শ্রমিকের কাজে লাগানোর চেয়ে বরং ঢের ভালো আর সস্তায় এলাকার বাইরের শ্রমিককে দালাল মারফৎ আনা এবং কাজ দেওয়া। ফলত গরিবের উপরোধ ধোপে টেঁকে না মোটে।

সেই অর্থে বলতে গেলে, গ্রামে কাজ পাওয়া সত্যিই একটা যুদ্ধ। সেখানে যারা খেতমজুর, তারা ধান - রোয়া আর কাটার মরসুম মিলিয়ে গড়ে বছরে খুব বেশি হলে নব্বুই দিন কাজ পান। যে অঞ্চ লে দুটি ফসলি চাষাবাদ হয়। সেখানকার মজুরদের মাথাপিছু কাজের পরিমাণটা একটু বাড়ে। কিন্তু, সেখানে আবার অন্য অনেক গপ্পো আছে।

বাস্তব যা, তা হল, মোটের উপর কাজ কমছে। মূলত দুইভাবে। পুঁজিপতি এবং চাষে বিনিয়োগারীদের সুযোগ করে দিয়ে চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ছে। প্রযুক্তি বলতে, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি। একটা সাধারণ পাওয়ার টিলারের খিদে কেমন শুনবেন?

সকাল থেকে বিকেল, একটানা আট - ঘন্টার কম - সময়ে একটি পাওয়ার - টিলার কম - বেশি ২৪ জন লোকের চাকরি খায়। এখন তো মাঠে ধান - ঝাড়াই -এর জন্য আধুনিক মেশিনও খুব বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তারও চেয়ে বড়ো ভাবনাটা অবশ্য অন্যত্র। সেটা এই যে, জমির চরিত্র বদল করে দেওয়া হচ্ছে। অনৈতিকভাবে। ব্যাপকহারে এমনই ঘটছে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে, সর্বত্র। যেমন, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চাষের জমি পাল্টে হয়ে যাচ্ছে জলকর। দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেও তাই। সেখানে স্থানীয় ভাষায় জলকরের নাম ভেড়ি অথবা ঘেরি। ভেড়িতে চাষ হয়। তবে চিংড়ির। দেশের বাইরে তার বৃহৎ বাজার। এই চাষ লাভজনক এই কারণে, যে, এতে শ্রমিক লাগে নাম মাত্র। সুন্দরবনের বহু অঞ্চ লে ভেড়ি তো প্রায় জোরজুলুমের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চাষের জমি আল কেটে রাতের অন্ধকারে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে নদীর লোনা - জল। যোজন-যোজন জমির ফসল নষ্ট হয়ে জমিগুলি বেশ কয়েক বছরের জন্য বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। ছোট - চাষি চাষ হারিয়ে তখন বিপন্ন। অন্য দিকে, জমিতে মাছ - চাষ করার মতো বিপুল আর্থিক বিনিয়োগেরও ক্ষমতা তার নেই। তখন তিনি বড়ো চাষি বা জলকর - মালিকের কাছে জমি বেচে দিয়ে অন্য পেশায় যাওয়ার কথা ভাবছেন। কিন্তু, এই বিশাল সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক দলের যাওয়ার জায়গা কোনটা? পশ্চি মবঙ্গের বাইরের রাজ্যগুলিতে অন্য এক সমীক্ষার কাজে গিয়ে দেখেছি, সেখানে মাঠের পর মাঠ আর খাদ্যশস্য ফলেনা। হয় অ-খাদ্যের চাষ। ফুলের, ফলের চাষ। কেবল জীবনধারণের জন্য চাষাবাদ আর লাভজনক হচ্ছে না বুঝে বড়ো জোতদারের কাছে জমি বেচে দিয়ে ভুমিহীন হয়ে যাচ্ছেন ছোট কৃষক, প্রান্তিক চাষিরা। এ-রাজ্যেরও কোথাও কোথাও শুনতে পাই দেখা দিচ্ছে এই প্রবণতা। অদক্ষ খেত মজুরদের দলে নাম লেখাচ্ছেন অধুনা ভূমিহীন প্রান্তিক ও ছোট চাষিরা। গ্রামে বড়ো চাষির খেতে দুই - মরসুম কাজ থাকলেও বড়ো চাষি কিন্তু পুরুষ খেতমজুরদের কাজ দিতে তেমন উৎসুক নয়। একে তো তার জমিতে মেশিন চলে। সিংহভাগ কাজ করে দেয় মেশিনই। মানুষের করার মতো যতটুকুকাজ অবশিষ্ট োকে তার জন্য জমির মালিক বরং পুরুষ খেতমজুরদের বাড়ির মহিলাদের নিয়োগ করতে বেশি ইচ্ছুক। কারণ, তাদেরই কথায়, মহিলা শ্রমিককে অনেক কম মজুরি দিলেও চলে। উপরন্তু, তারা নাকি ফাঁকিও দেয় কম।

প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে তখন পুরুষ - মজুররা কোথায় যায়? পশ্চি মবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে একটা বড়ো সংখ্যক মজুর চলে যায় বর্ধমানে। সেখানে আলুর কোল্ড স্টোরেজে বস্তা ওঠানো নামানোর কাজ করে। একটা অংশ চলে যায় দেশের পশ্চি মাঞ্চ লে,প্যান্ডে ল বা ম্যারাপ বাঁধার কাজ নিয়ে। অন্য একটা অংশ দল বেঁধে চলে আসে কলকাতায়। কখনও মেটিয়াবুরুজে দর্জির দোকানে, কখনও কলকাতার বাসে - ট্রামে বাদাম -ছোলা বিক্রিতে মন দেয়। দক্ষিম ২৪ পরগণায় এমন গ্রামও দেখেছি, যেখানে বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসের জন্য গ্রামগুলি পুরুষ - শূন্য হয়ে যায়। মানসিক বাঁধন আলগা হয়ে যায়। পরিবার ভেঙে যায়। সারল্যের গ্রামে থাবা বসায় শহুরে সংস্কার। ছবি বদলে যায়।

দীর্ঘনিঃস্বতায় আমার দিন রাত্রি;গনগনে গরমে ধুঁকতে ধুঁকতে, শীতের রাতের ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে/ বর্ষার জলে ভিজতে ভিজতে। আমি নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে গেলাম।

তারাপদ রায়, দারিদ্র্যরেখা।

গ্রামের উদ্বৃ ত্ত শ্রমিক যে শহরে অনাহুত, সেই বার্তা সরকারি উদ্যোগে একাধিক উচ্ছেদ - অভিযানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া গেছে সাফল্যের সঙ্গে। ঘটনা হল, এ - রাজ্যে যেমন

অনেক রীতি নীতিরই কোনও বালাই নেই, তেমনি সরকারি বিধি মেনে মজুরি দেওয়ারও রীতি নেই। গ্রামের মজুরদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানেন না। আসলে, বাজারমুখী অর্থনীতির পরিভাষায় সবই সেই চিরাচরিত চাহিদা আর যোগানের গপ্পো। সেই গপ্পে শ্রমও পণ্য। নদিয়ায় ধুবুলিয়া নামে এক ছোট জায়গা আছে। প্রত্যেক সপ্তাহের এক নিদিষ্টি দিনে সেখানে শ্রমিকের 'হাট' বসে। সেই হাটে আপনি দিনে পঁচিশ টাকার কম মজুরিতেও শ্রমিক পেয়ে যেতে পারেন। যোগান অজস্র যে, কুলনায় চাহিদা নামমাত্র।

এর মধ্যে আবার একদল স্বার্থান্বেষী লোক আছে, যাদের ভুললে চলবে না। গ্রামে কাজ - না - থাক শ্রমিককে সামান্য টাকাঅগ্রিম হিসেবে দিয়ে এরা তাদের ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে, এমন কী অন্য রাজ্যে। ইঁট - ভাটায়, কোল্ড স্টোরেজে, ডেকরেটবের কাছে, কাজ দেয়। এক থোকে অগ্রিম পেয়ে মহানন্দের তাদের সঙ্গে বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে চলে আসে মজুরেরা। সেই 'মাধ্যম'হিসেবে কাজ করা লোকগুলি কিন্তু কোদিক্রমে গরিব মজুরের নামমাত্র মজুরিতে থাবা বসিয়ে এবং সরাসরি মালিকের কাছ থেকে 'কমিশন' নিয়ে দুইভাবেই নিজেদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে নেয়। সেই অর্থে বলতে গেলে অনাহার একটা উপসর্গ মাত্র। আসল রোগ অনেক গভীরের। তার পিছনে লম্বা উপন্যাসের মতো এক গল্প - গাঁথা। সলতে পাকানোর প্রলম্বিত ইতিহা। বেঁচেবর্তে থাকতে গেলে অর্থ চাই। সেই অর্থ দিয়ে আমি চাল কিনব, ডাল কিনব, কাপড় কিনব। গ্রামের প্রবীণেরা বলে থাকেন, আজ থেকে দশ বছর আগেও গ্রাম অন্যরকম ছিল। যাদের দু'বেলা ভালো করে খাওয়া জোটানো মুশকিল ছিল, তাদের মেয়ে - বৌরা নদীতে 'মীন' ধরত।সেই 'মীন' বাজারে বিক্রি করত। পুকুরের ধার থেকে তুলে আনত শাক-পাতা। এখন আর তার জো নেই। নদী খেন জলকর মালিকের। পুকুর ও এখন মালিকের। বাগান প্রভূর। সামাজিক সম্পদের ধারণা প্রায় লুপ্ত। এমন একটা নড়বড়ে সময়, যখন 'ভালো আছেন'? প্রশ্নটাও শোনায় ব্যঙ্গের মতো। ক্ষোভ হয়। এ-লেখা শুরু করেছিলাম কুলপির যে মহিলার প্রসঙ্গ নিয়ে, প্রায় তারই মতো একজনকে খুঁজে পেয়েছিলাম গত বছর আমলাশোলে। তার নাম কোকিলা শবর। তার বলিরেখা সর্বস্ব শুকনো মুখ আসল বয়েসকে ঘুমপাড়িয়ে রেখেছে। তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। দিনের পর দিন ভাত জোটে না - বলছিলেন। কিন্তু, অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে। মাটির দিকে চোখ রেখে। চোখে এতটুকু জল ছিলনা। কান্না শুকিয়ে গিয়েছিল। এরা মাটির মতো সর্বংসহা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, মাটিও তো কখনও কখনও কেঁপে ওঠে! অবাক হয়ে দেখেছি, কী অসীম কষ্টে জীবনের মতো এক ভরাবাহী গাড়িকে টেনে নিয়ে চলে শবর শ্রেণীর মানুষেরা! দিনে খুব বেশি হলে দশ থেকে বারো টাকা রোজগার। তাও যে বন ছিল জীবন ধারণেক সহায়, সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর সেখানেও প্রবেশাধিকার বাতিল করেছে। উত্তরবঙ্গের চা - বাগানে হাজার খানেক মানুষের মৃত্যু - সে তো আরও বড়ো অনাহারের ঘটনা। শুধু মৃত্যুই সব নয়, শরীরের নিদিষ্ট ভিটামিনের অভাবে জন্মের মতো চোখের জ্যোতি হারিয়েছে কত শিশু! শহর থেকে বহু দূরে বাস করা চা-বাগানের কুলি - লাইনের নিরন্ন মানুষগুলি খাবারের অভাবে মেঠো ইঁদুর মেরে খেয়েছে, পানীয় জলের অভাবে খেয়েছে নালার জল। সরকারি প্রকল্পগুলি তখন নেহাত স্বেচ্ছাচারী। তাই, উল্টো দিকে আই সি ডি এস কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ থাকায় খিদের জ্বালায় কাঁদতে - কাঁদতে মায়ের কোলেই মারা গেছে তার দুই শিশু - সন্তান। এই ঘটনা তো ভুলে যাবার নয়। ভূমি - সংস্কার সত্যিই হোক বা না হোক, এই ঘটনা সত্যি। সত্যি এও, স্বার্থান্বেষী পঞ্চ ায়েত ও প্রশাসন তখন দুর্নীতি পরায়ণ রেশন - ডিলারের কেচ্ছা চাপা দিতে ব্যস্ত ছিল। এখনও থাকে। এখনও পঞ্চ ায়েত প্রধানের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলে, কাজ চাইতে গলে সে দায় এড়িয়ে বলে, 'ব্লক দেবে, ব্লক জানে।' ব্লক দেখায় ডি এম কে। ডি এম বলেন, উপর মহলে যাও। উপরমহল বলে, 'কেন্দ্র দেয়নি'। এ-সবই সত্যি। এটাই ধারা। 'তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা।'

Lubdhak - Kabita – Short – [Pal Aluar (1895-1952 (Farsi Kabia))] Translated by Ananta Das - Premika

লুব্ধক - পল এলুয়ার (১৮৯৫-১৯৫২, ফরাসি কবিতা থেকে অনুবাদ) অনুবাদ - অনন্ত দাস - প্রেমিকা

সে আছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের পাতায়
তার কেশভার আমার চুলের মাঝে
তার ত্বক যেন আমার চোখের মত
তার তনুদেহ ঠিক যেন এই হাত
সেও ঢেকে যায় আমার দেহের ছায়ার
সে বড় মূর্ত আকাশেও বিস্তৃত
সে কই বন্ধ করে না তো দুটো চোখ
আর আমাকেও দেয় না একটু ঘুমোতে
তার তো স্বপ্ন উজ্জ্বল দিবসেই
যেন উবে যায় সূর্যের আলোতে
আমাকে হাসায় কাঁদায় হাসায় আর
বাঙ্ময় থাকি যখন বলার নেই।